আমাদের পূর্বপুরুষ কি বানর?

Critical analysis of Evolution Theory

আশীষ আর্য

ওতম্
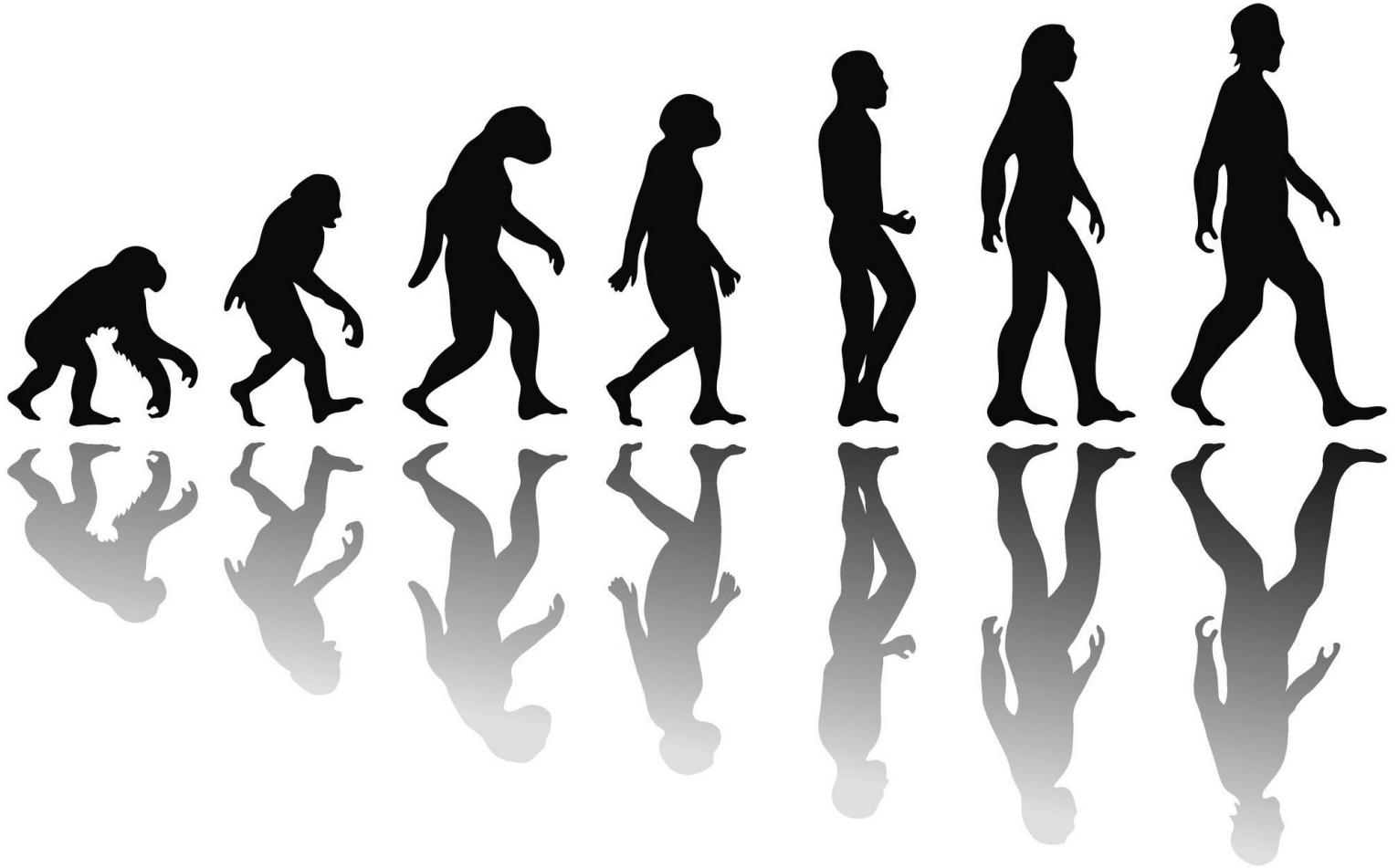
প্রায় ১ বছর পূর্বে যখন কেন্দ্রীয় মানব সংসাধন বিকাশ রাজ্যমন্ত্রী সত্যপাল সিংহ জী একটা বক্তৃতায় বলেছিলেন যে – Darwin Theory সত্য নয়, একথা বলামাত্রই অনেক বুদ্ধিজীবী ওনার বিরোধ করতে থাকে আর পরদিনই অনেক অধ্যাপক ওনার বিরুদ্ধে পিটিশন দায়ের করে।

অন্যদিকে সত্যপাল সিংহ জীর কথাকে নাসার পূর্ব বৈজ্ঞানিক প্রফেসর ডা০ ওমপ্রকাশ পাণ্ডে জী সমর্থন করেছেন আর বলেছেন যে – ডারউইনের ছেলেই নিজের পিতার বিকাশবাদকে কাল্পনিক বলে মনে করতেন। অর্থাৎ তিনিও ডারউইনের সিদ্ধান্তকে ভুল মনে করতেন।

সেইসময় আচার্য অগ্নিব্রত নৈষ্ঠিক জী ডারউইনের থিওরির উপর অনেক প্রশ্ন লিখে সব বুদ্ধিজীবীদের চ্যালেঞ্জ করেন আর বেশ কয়েকটা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরদের কাছে পাঠিয়ে দেন, কিন্তু সেইসব প্রশ্নের উত্তর কেউই দিতে পারে নি.

এখন আসুন দেখেনি আচার্য অগ্নিব্রত জী কি কি প্রশ্ন করেছিলেন, ওনার সেই চিঠিটা নীচে দেওয়া হল।

“

সারা বিশ্বের বিকাশবাদীদের নিকট প্রাথমিক প্রশ্ন –

এই কিছু দিন পূর্বে কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন রাজ্যমন্ত্রী শ্রীমান ডা০ সত্যপাল সিংহ জীর এই বক্তব্য যে– মানুষের উৎপত্তি বানর থেকে হয়নি, তাতে সারা ভারতের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে কোলাহল শুরু হয়ে গেছে।

কিছু বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার মহানুভব একে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা-

জন্য রূঢ়বাদী চিন্তাভাবনার সংজ্ঞা দিচ্ছেন।

আমি সেই মহানুভবদের কাছে নিবেদন করবো যে, মন্ত্রীজীর এই বিচার রূঢ়বাদী নয় বরং সুদৃঢ় তর্কের উপর আধারিত বৈদিক বিজ্ঞানেরই পক্ষ। এমন নয় যে কেবলমাত্র কিছু ভারতীয় বিদ্বানই বিকাশবাদের এই সিদ্ধান্ত অস্বীকার করেন, ইউরোপের এমন অনেক বিজ্ঞানীও আছেন যারা এই সিদ্ধান্ত অস্বীকার করে আসছেন।

আমি সংসারের সব বিকাশবাদীদের প্রশ্ন করতে চাইবো যারা এর বিরোধিতা করছেন. এগুলো প্রাথমিক প্রশ্ন আর উত্তর পাওয়ার পর আরও প্রশ্ন করা হবে –

শারীরিক বিকাশ :

১. বিকাশবাদীরা অ্যামিবা থেকে বিকশিত হয়ে বানরে তারপর ধীরে-ধীরে মানুষের উৎপত্তি হওয়াকে বিশ্বাস করে. তারা বলুক, অ্যামিবার উৎপত্তি কিভাবে হয়েছে ?

২. যদি জীবন অন্য গ্রহ থেকে আসে, তাহলে সেখানে কিভাবে উৎপত্তি হয়েছে ? যখন সেখানে উৎপত্তি হতে পারে তাহলে এই পৃথিবীতে কেন হতে পারে না ?

৩. যদি রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে কোনো গ্রহে অ্যামিবার উৎপত্তি হয়, তাহলে কেন মানুষের শুক্রাণু ও ডিম্বাণু একইভাবে উৎপন্ন হতে পারবে না ?

৪. উড়ার আবশ্যকতা হয়েছে বলেই নাকি প্রাণীদের শরীরে ডানা এসেছে,

অথচ মানুষ যখন উৎপন্ন হয়েছে তখন থেকেই উড়ার জন্য বিমান আদি তৈরির চেষ্টা করেছে, তাহলে তাদের কেন কোনো ডানা হয়নি? যদি এমন হতো তাহলে বিমান আদি আবিষ্কারের আবশ্যকতাই হতো না।

৫. শীত প্রধান দেশে শরীরে লম্বা লোমের বিকাশের কথা বলা হয়েছে, তাহলে শীত প্রধানদেশে জন্মানো মানুষদের কেন ভাল্লুকের মতো লোম হয়নি ? তাদের কেন কম্বল আদির আবশ্যকতা হয়েছে?

৬. জিরাফের গলা লম্বা হয়েছে কারণ পৃথিবীর ঘাস শুকিয়ে যাওয়াতে গলা উঁচু করে গাছের পাতা খেতো বলে। আচ্ছা বলুন তো, কত বছর পর্যন্ত নিচের ঘাস শুকনো আর গাছের পাতা সবুজ ছিল? অথচ ছাগলরা আজও তাদের দুটো পা গাছের উপর তুলে গাছের পাতা খায়, তাহলে তাদের গলা কেন লম্বা হয়নি?

৭. বাঁদরের লেজ অদৃশ্য হয়ে মানুষ হয়ে গেল! কেউ কি বলতে পারবেন বাঁদরের লেজ কিভাবে উধাও হয়ে গেল? তারা কি লেজের ব্যবহার বন্ধ করেছে? কেউ কি বলতে পারবেন বাঁদর তার লেজ দিয়ে কি ব্যবহার করে আর সে সেই ব্যবহার কেন বন্ধ করেছে? যদি এমনই হয় তাহলে মানুষেরও নাক, কান আদি অদৃশ্য হয়ে কেবল ছিদ্রই থাকতো। মানুষ লক্ষ-লক্ষ বছর ধরে নখ, চুল কেটে আসছে তবুও বারংবার উৎপন্ন হতে থাকে, এমনটা কেন হয়?

৮. সব বাঁদরের বিকাশ হয়ে মানুষ হয়ে যায়নি কেন? কিছুতো অ্যামিবার রূপেই চলে আসছে আর কিছু মানুষ হয়ে গেছে, এমনটা কেন?

৯. বলা হয়েছে যে সাপেরও নাকি আগে পা ছিল, সেটা নাকি ধীরে-ধীরে ঘসে-ঘসে অদৃশ্য হয়ে গেছে। পা কিভাবে অদৃশ্য হয়েগেছে একটু ভাবুন, অথচ অন্য সব পা-ওয়ালা প্রাণীদের পা একদম ঘসে যায়নি।

১০. হাড়হীন প্রাণী থেকে হাড়-ওয়ালা প্রাণী কিভাবে হয়ে গেল? তাদের কেন সেই হাড়ের প্রয়োজন হল?

১১. বাঁদর আর মানুষের মাঝে যে প্রাণীদের শৃঙ্খলা তৈরি হয়েছিল সেটা কোথায় গেল?

১২. বিকাশ কেন মানুষের মধ্যেই এসে থেমেছে? একে কে থামিয়েছে? তাদের কি বিকাশের কোনো প্রয়োজন নেই?

বৌদ্ধিক আর ভাষার বিকাশ :

১. বলা হয়েছে যে, মানুষ নাকি ধীরে-ধীরে বুদ্ধিমত্তার বিকাশ ঘটিয়েছে, তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে বাঁদর আর অন্য প্রাণীদের মধ্যে কেন বৌদ্ধিক বিকাশ ঘটেনি?

২. মানুষ জন্মানোর সময় এই পৃথিবীতে শুধু পশু-পাখিই ছিল, তাহলে মানুষ কেন তাদের আচরণ শিখলো না? মানুষের আচরণের বিকাশ কিভাবে হয়েছে? কোটি-কোটি বনবাসীর মধ্যে কেন এখনো বিশেষ মেধার বিকাশ হয়নি?

৩. গরু, মোষ, ঘোড়া, ভেড়া, ছাগল, উট, হাতি লক্ষ-লক্ষ বছর ধরে মানুষদের গৃহপালিত প্রাণী তা সত্ত্বেও তারা মানুষের ভাষা বা মানুষের আচরণ শিখেনি, তাহলে মানুষের মধ্যেই এই বিকাশ এলো কোথা

থেকে?

৪. যে পতঙ্গ কোটি-কোটি বছর যাবৎ প্রদীপে জ্বলেও যথেষ্ট বৌদ্ধিক বিকাশ ঘটাতে পারেনি নিজেকে জ্বলন্ত প্রদীপ থেকে বাঁচাতে, অথচ বাঁদর থেকে মানুষ এত বুদ্ধিমান হয়ে উঠেছে যে সে মঙ্গল গ্রহে যাত্রা করতে প্রস্তুত? এটা জানার বুদ্ধিও কি বিকাশবাদীদের মধ্যে গড়ে ওঠেনি? সাপুড়িয়া আগে বীণ বাজিয়ে সাপকে ধরতো আর আজও একই কাজ করে কিন্তু সাপটার এইটুকু জ্ঞানেরও বিকাশ হয়নি যে সাপুড়িয়ার হাতে ধরার থেকে বাঁচবে.

৫. মানুষ আগে শক্তি, স্মৃতিশক্তি আর শারীরিক প্রতিরোধের দিক থেকে বর্তমানের তুলনায় অনেক বেশি সমৃদ্ধ ছিল, আজ কেন তাদের এইরূপ পতন হয়েছে, তাদের তো বিকাশ হওয়া উচিত ছিল?

৬. সংস্কৃত ভাষা, যা হচ্ছে প্রাচীনতম ভাষা, এর ব্যাকরণ বর্তমান বিশ্বের সব ভাষার চেয়ে অধিক সমৃদ্ধ আর ব্যবস্থিত, তাহলে ভাষার দৃষ্টিকোণ থেকে উন্নয়নের জায়গায় অবনতি কেন হয়েছে?

৭. প্রাচীন ঋষিদের গ্রন্থে ভরা বিজ্ঞানের সামনে বর্তমান বিজ্ঞান অনেক ক্ষেত্রেই পিছিয়ে আছে (আমি এটা এখনই প্রমাণ করবো), তাহলে বিজ্ঞানের এই অধঃপতন কেন হয়েছে? ঋষিরা আগে কেবল অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমেই বিশ্বজগতের জ্ঞান লাভ করতেন, অথচ আজ অনেক সম্পদের মাধ্যমেও সেই জ্ঞান পাওয়া যায় না। এই বিপরীত ক্রম কেন ঘটল?

ভালো করে ভেবে দেখুন, যদি পশু-পাখির বৌদ্ধিক বিকাশ হতো

তাহলে একটাও পশু-পাখি মানুষের নিয়ন্ত্রণে আসতো না।

এটা কেমন অজ্ঞানতাপূর্ণ সিদ্ধান্ত! যেটা মানছে যে, পশু-পাখির বৌদ্ধিক বিকাশ হয় না কিন্তু তাদের শারীরিক বিকাশ তাদেরকে মানুষে পরিণত করে, আবার মানুষের মধ্যে শারীরিক বিকাশ না হয়ে শুধু ভাষা আর বৌদ্ধিক বিকাশই হয়! এর কারণ কি বিকাশবাদীরা আমাকে জানাবেন।

আজ বিকাশবাদ ভাষী বক্তা বা পৌরাণিক ভাইরা শ্রী হনুমান জীকে বাঁদর বলে, তাদের 'বাল্মীকি রামায়ণ' সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান নেই। বস্তুতঃ বানর, ঋক্ষ, গৃধ, কিন্নর, অসুর, দেব, নাগ আদি মানব জাতিরই বিভিন্ন বর্গ ছিল। ঐতিহাসিক গ্রন্থে প্রক্ষেপ (ভেজাল) সনাক্ত করা একটা শ্রমসাধ্য আর বুদ্ধিমানের কাজ।

অপরদিকে, জ্ঞানী বিদ্বানরা যারা বৈজ্ঞানিক জার্নালের একটা গবেষণাপত্র প্রকাশকে সত্যতার মাপকাঠি বলে মনে করেন, তাদের কাছে আমার অতি সংক্ষিপ্ত বিনীত অনুরোধ –

১. Big Bang Theory আর এর বিরুদ্ধে অনাদি ব্রহ্মাণ্ড থিওরি, উভয় পক্ষের গবেষণাপত্রই এই ম্যাগাজিনের মধ্যে প্রকাশিত হয়, তাহলে কোন থিওরিটাকে আপনি সত্য বলে মনে করেন ?

২. Black Hole আর Black Hole না হওয়ারও থিওরি এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, তাহলে কোনটা বিশ্বাস করবেন?

৩. মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ আর তার অ-সম্প্রসারণের থিওরি উভয়ই প্রকাশিত হয়েছে, তাহলে কোনটা বিশ্বাস করবেন?

এইরকম অনেক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। এইজন্য আমাদের যে একটা বর্গ বিশেষ থেকেই সত্যতার প্রমাণ নেওয়ার প্রয়োজন হবে সেটা আবশ্যক নয়। আমাদের বৈদিক আর ভারতীয় দৃষ্টিকোণ দ্বারা, সঠিক যুক্তি, পবিত্র গূঢ় ঊহা আর যোগসাধনা (ব্যায়াম নয়) দ্বারা প্রাপ্ত সিদ্ধান্ত বর্তমান সম্পদ দিয়ে করা গবেষণা, অনুমান আর গণিতের চেয়ে বেশি প্রামাণিক হবে.

যদি গবেষণা, পর্যবেক্ষণ, গণিতের সঙ্গে সঠিক যুক্তি আর ঊহা না থাকে তাহলে বিজ্ঞানীদের পুরো শ্রম বৃথা যেতে পারে। এইজন্য যারা কেবল গবেষণা, পর্যবেক্ষণ আর গণিতকে ভিত্তি হিসেবে বিশ্বাস করে তথা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তারা এই সম্পদের জন্য প্রতিবছর ট্রিলিয়ন ডলার ব্যয় করছে আর বিভিন্ন মনগড়া Theory নির্বিচার ঢঙে প্রস্তুত করছে আর সবাই নিজেকেই সত্য বলছেন. বিজ্ঞান যদি সর্বত্র কেবল গণিত আর গবেষণার ভিত্তি হিসাবেই বিবেচনা করা হয়, তাহলে গণিত আর গবেষণার উপর নির্ভর করে কেউ কি বিকাশবাদ দেখাবেন?

এইজন্য দেশ আর বিশ্বের শ্রদ্ধেয় বিজ্ঞানী আর প্রবুদ্ধগণের কাছে অনুরোধ করবো যে, প্রত্যেক প্রাচীন জ্ঞানের উপর অন্ধবিরোধ তথা বর্তমান পদ্ধতির অন্ধানুকরণ করে বৌদ্ধিক দাসত্বের পরিচয় দেবেন না।

যৌক্তিক দৃষ্টির সাহায্য নিয়ে সত্যকে গ্রহণ করার আর মিথ্যাকে ত্যাগ করার চেষ্টা করুন। তবে হ্যাঁ, বিজ্ঞানের সম্মুখে নিজের সাম্প্রদায়িক

রূঢ়বাদী বিচারধারাকে তুলে ধরার চেষ্টা করা অবশ্যই আপত্তিকর। ওম্ শম্

– **আচার্য অগ্নিব্রত নৈষ্ঠিক**

,,

এই গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধটা যখন অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের কাছে পাঠানো হয়েছিল তখন এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের কোনো উত্তরই কেউ দেয়নি।

নাসার পূর্ব বৈজ্ঞানীক প্রফেসর ডা০ ওমপ্রকাশ পাণ্ডে জী এমনও বলেছেন যে সত্যপাল সিংহ জীর বিরুদ্ধে একসাথে অনেক অধ্যাপক দ্বারা পিটিশন দায়ের করা হচ্ছে একটা সুচিন্তিত ষড়যন্ত্র, আজ শিশুদের ভুল ইতিহাস শেখানো হচ্ছে, আমাদের পূর্বপুরুষরা বাঁদর ছিল না।

মানুষ যুবকাবস্থায় ভূমিতে উৎপন্ন হয়েছে...

— আচার্য অগ্নিব্রত নৈষ্ঠিক

(বিশ্ব বৈদিক বিজ্ঞানী)

উচ্ছ্বঞ্চমানা পৃথিবী সু তিষ্ঠতু সহস্রং মিত উপ হি শ্রয়ন্তাম্।
তে গৃহাসো ঘৃতশ্চুতো ভবন্তু বিশ্বাহাস্মৈ শরণাঃ সন্ত্বত্র॥ (১০.১৮.১২)

সৃষ্টি আর মানুষের উৎপত্তি বৈজ্ঞানিক জগতের জন্য কৌতূহলের বিষয়। চার্লস ডারউইনের বিকাশবাদের পরিকল্পনার পর থেকেই তার সমর্থক তথা বিরোধী উভয় পক্ষেরই বিতর্ক চলছে। বিকাশবাদীদের স্বীকৃতি হল, অ্যামিবা থেকে মানুষ পর্যন্ত শৃঙ্খলাকে ক্রমিক বিকাশের দান বলে তারা মনে করে, যারমধ্যে বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে পরিস্থিতি অনুকূল কিছু পরিবর্তন হয় আর সেটা থেকেই নতুন-নতুন প্রজাতিগুলো হয়েছিল। এইভাবে এই বিচারধারা অনুসারে মানুষ আর অন্য সব পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ আদি সবার পূর্বপুরুষ একই ছিল তথা আধুনিক বানর হল মানুষের সর্বাধিক নিকটতম সম্বন্ধী। বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিকাশ স্বয়ংক্রিয়ভাবে অবশ্যকতানুসারে হয়েছে অর্থাৎ একটা প্রাণী অন্য একটা প্রাণীতে কোনো বিকৃতির কারণে বদলেছে. এই বিকাশবাদের বিরুদ্ধে অনেক বিদেশী বৈজ্ঞানিকরা বিভিন্ন সময়ে অনেক সিদ্ধান্ত দিয়েছে. শারীরিক বিকাশ, বৌদ্ধিক বিকাশ আর ভাষার বিকাশ এই তিন বিষয়ের উপরেও বিকাশবাদের বিরোধী বিদেশী বৈজ্ঞানিকরা অনেক গম্ভীর প্রশ্ন তুলেছে, কিন্তু বিকাশবাদীরা কখনও এই প্রশ্নগুলোর সঠিকভাবে উত্তর দিতে পারেনি. এদিকে ভারতে মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী আর তাঁর অনুগামী অনেক বিদ্বানরা বিকাশবাদের এই সিদ্ধান্তকে মিথ্যা প্রমাণিত করেছে, তা সত্ত্বেও ডারউইনের বিকাশবাদ সিদ্ধান্ত আজও কিছু পূর্বাগ্রহী বৈজ্ঞানিকদের কাছে আদর্শ সিদ্ধান্ত হয়ে আছে।

এই কিছুদিন পূর্বে কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন রাজ্যমন্ত্রী শ্রীমান

ডা০ সত্যপাল সিংহ জীর বক্তব্য যে – আমরা সবাই বানরের নয় বরং মানুষেরই সন্তান, কিন্তু এই মহানুভবরা কোলাহল করতে-করতে ওনার উপর চতুর্দিক থেকে আক্রমণ করতে থাকে। দেশের বৈজ্ঞানিক আর বৈজ্ঞানিক সংস্থাও একজোট হয়ে যায়। আমিও এই সকলের কাছে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে অনেক প্রশ্ন করেছিলাম কিন্তু কোনো প্রমাণিত সংস্থা বা বিদ্বান আমার প্রশ্নের উত্তর দেয়নি বরং কিছু মহানুভব অহেতুক প্রলাপই করেছেন। এই মহানুভবরা কোনো দেশী বা বিদেশী অথবা কোনো বিচারকের বক্তব্যই হোক না কেন, কখনোই স্বীকার করবে না যে আমরা মানুষের সন্তান ?

আমার প্রশ্নের উত্তরের বদলে কেবল আমার সিদ্ধান্ত জানার ইচ্ছুক মহানুভবদের জন্য আমি বৈদিক বিকাশবাদের উপর আমার সংক্ষিপ্ত বিচার প্রস্তুত করছি –

বস্তুতঃ 'বিকাশবাদ' শব্দটার উপর বিচার করুন, তো শব্দটা উত্তম আর সার্থক, কিন্তু ডারউইন আর তার সমর্থকরা এই শব্দটার সঠিক অর্থ জানে না আর তারা তাদের অবৈজ্ঞানিক মতকে 'বিকাশবাদ' বিশেষণের মধ্যে বিভূষিত করতে প্রচেষ্টা করেছে। যদি আমরা সম্পূর্ণ সৃষ্টির উপর গম্ভীরভাবে বিচার করি, তাহলে স্পষ্ট দেখা যাবে যে সম্পূর্ণ সৃষ্টি আর তার উৎপন্ন হওয়া প্রত্যেকটা পদার্থ বিকাশের সিঁড়ি চড়তে-চড়তেই বর্তমান স্বরূপে আজ দেখা যাচ্ছে। ক্রমিক বিকাশ বিনা প্রাণী জগতের কি বলবো, কোনো লোক-লোকান্তর কিংবা একটা কণা, ফোটন আদিও নির্মাণ হবে

না। বৈদিক বিজ্ঞান বিকাশবাদের খুব ব্যাখ্যা করে কিন্তু আমাদের বিকাশবাদ কখনোই ডারউইনের বিকাশবাদ নয়। ডারউইনের বিকাশবাদ বস্তুতঃ বিকাশবাদ নয় বরং সেটা হচ্ছে অনিয়ন্ত্রিত বুদ্ধিবিহীন য়দৃচ্ছায়াবাদ (মনগড়া), যাকে ভদ্রবশ বৈজ্ঞানিকরা বিকাশবাদ নামে আখ্যা দিচ্ছে.

আসলে বিকাশের অর্থ হল – 'বীজ থেকে অঙ্কুর, অঙ্কুর থেকে বৃক্ষ আর সেখান থেকে পুষ্প, ফল আর পুনঃ বীজ উৎপন্ন হওয়া।' বিজ্ঞান আজ যাকে মূল কণা মানছে, সেই কোয়ার্ক তথা ফোটনসও মূল পদার্থ নয়। সেটা হচ্ছে সূক্ষ্ম ঘনীভূত রূপ অর্থাৎ সেটা রশ্মির নানা সমুদায়ের বিকশিত রূপ। যে String theorist এই কণাকে সূক্ষ্ম String দ্বারা তৈরী বলে মনে করছে, সেই String-ও মূল তত্ব নয় বরং সেটা হচ্ছে বৈদিক রশ্মির ঘনীভূত আর বিকশিত রূপ। স্ট্রিং আর কণা বা ফোটনস সম্বন্ধে বর্তমান বিজ্ঞান অনভিজ্ঞ. জীববিজ্ঞানীরা যে অ্যামিবাকে সবথেকে ছোট ইউনিট বলে মনে করে বা তার ভিতর বিদ্যমান গুণসূত্র, জীন্স, D.N.A. আদিকে সূক্ষ্মতম পদার্থ বলে মনে করে, তারা জানে না যে 'যেখানে তাদের জীববিজ্ঞান সমাপ্ত হয়ে যায়, সেখানে ভৌতিক বিজ্ঞান শুরু হয় আর যেখানে ভৌতিক বিজ্ঞান সমাপ্ত হয়, সেখানে বৈদিক ভৌতিক বিজ্ঞান শুরু হয় আর যেখানে বৈদিক ভৌতিক বিজ্ঞানের সীমা সমাপ্ত হয়, সেখানে বৈদিক আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান শুরু হয়।' আজ সমস্যা হচ্ছে এটাই যে, বৈদিক ভৌতিক বিজ্ঞান আর বৈদিক আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানকে নিতান্ত অবহেলা করে বা তার উপহাস আর বিরোধ করে ভৌতিক বিজ্ঞান আর

জীব বিজ্ঞান আদির সমস্যার সমাধান করার প্রচেষ্টা চলছে। এটাও এক দুঃখজনক সত্য যে, সংসারকে বৈদিক ভৌতিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে বোঝানোর ব্যক্তি এখন কোথায়? এইজন্য বর্তমান বিজ্ঞান অনেক সমস্যায় গ্রস্থ হয়ে আছে তথা একটা সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করে, তো অনেক নতুন সমস্যাও উৎপন্ন করে ফেলে. একটা টেকনোলজির আবিষ্কার করছে তো তার নানা দুষ্প্রভাবকেও উৎপন্ন করে ফেলছে, ওষুধের বিকাশের সঙ্গে-সঙ্গে রোগেও নিরন্তর বিকাশ হচ্ছে, সুখ-বিলাসিতা বিকাশের সঙ্গে-সঙ্গে অপরাধ আর প্রকৃতি প্রদূষণকেও সমৃদ্ধি করে চলেছে। এইসব সমস্যার মূল কারণ হল বর্তমান বিজ্ঞানের অপূর্ণ জ্ঞান, আর কারণ হল বৈদিক বিজ্ঞানকে উপেক্ষা করা। অস্তু।

আমরা কথা বলছিলাম যে সৃষ্টির প্রত্যেক কথিত মূলকণা বা ফোটন হল সূক্ষ্ম বৈদিক রশ্মির অতি বুদ্ধিমত্তাপূর্ণ সংযোগ দ্বারা তৈরী. সেই রশ্মিগুলো আবার মনস্তত্ব আর মহতত্ত্ব, কাল আর প্রকৃতির সংযোগ দ্বারা তৈরী হয়েছে। সবার আগে সর্বনিয়ন্ত্রক, সর্বশক্তিমান, সর্বব্যাপক, নিরাকার, সর্বজ্ঞানী, চেতনকর্তা ঈশ্বরের প্রেরণা আছে। সৃষ্টির সর্বাধিক সূক্ষ্ম তত্ত্ব প্রকৃতি থেকে বর্তমান মূলকণা পর্যন্ত বিকাশের এই পথ অনেক লম্বা আর এরমধ্যে ব্যবস্থিত বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া আছে, যাকে নিয়ে বর্তমান ভৌতিক বৈজ্ঞানিকদের বিশেষ কোনো বোধ নেই। মূলকণা আর ফোটনের উৎপত্তি থেকে নক্ষত্র, গ্রহ-উপগ্রহ পর্যন্ত নির্মাণের বিকাশের এই যাত্রার চর্চা এখানে করা উচিৎ হবে না। তবে বর্তমান Cosmology, Particle

Physics, Astrophysics, Quantum field theory, String theory -র মতো বিভিন্ন সংস্থাগুলো এই বিষয়টা সম্বন্ধে নিজেদের সীমার ভিতরে ব্যাখ্যা করে। আমারও বিষয় এই বিষয়গুলোর গভীরে আলোকপাত করা। জীব-বিজ্ঞান আমার বিষয় নয়, তা সত্ত্বেও বর্তমান অন্ধকার কোলাহলের মাঝে কিছু যুবকের অনুরোধে আমি আমার কথা ভৌতিক বিজ্ঞানের গম্ভীরতা ছেড়ে বনস্পতি আর প্রাণী জগতের উৎপত্তির উপরই কেন্দ্রিত করছি। যখন পৃথিবীর মতো কোনো গ্রহ নক্ষত্র থেকে পৃথক হয়, কিংবা নক্ষত্র সেই গ্রহ থেকে দূরে সরে যায়, সেইসময় গ্রহের স্বরূপ আগ্নেয় হয়. ধীরে-ধীরে সেই আগ্নেয় রূপ ঠান্ডা হয়ে দ্রবীয় রূপে পরিণত হতে থাকে আর সেইসময় উৎপন্ন জলীয় বাষ্প ক্রমে-ক্রমে ঠান্ডা হয়ে বৃষ্টি হওয়াতে পৃথিবী জলমগ্ন হয়ে যায়. উচ্চতার কারণে যে ভাগ জলের বাইরে থাকে সেখানে জীবনের উৎপত্তি হেতু প্রয়োজনীয় তত্ত্ব অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, কার্বন, নাইট্রোজেন, D.N.A., R.N.A., Fat, অ্যামিনো অম্ল, প্রোটিন, জল আদি বিভিন্ন রাসায়নিক অভিক্রিয়াগুলো নিরন্তর চলার কারণে উৎপন্ন হওয়া শুরু করে। এই উৎপত্তিতে কয়েক সহস্র বছর লেগে যায়। এইসব পদার্থ এই পৃথিবীর উপর সর্বত্র দ্রব্য আর গ্যাস রূপে ভরে যায়। সদ্য উৎপন্ন সাগরেও এই পদার্থ উৎপন্ন হওয়া শুরু করে। এরপর পুনঃ অগ্রিম বিকশিত আর সংযুক্ত রূপে এক কোষীয় বনস্পতির উৎপত্তি হয়। বিভিন্ন পরমাণু (Atoms) আর ছোট অণু (Molecules)-র বিশিষ্ট আর বুদ্ধিপূর্ণ সংযোগ দ্বারা বনস্পতি (উদ্ভিদ) কোষের উৎপত্তি হচ্ছে অতি রহস্যময়ী

আর ব্যবস্থিত প্রক্রিয়া। এটা সবসময় মনে রাখতে হবে যে, সূক্ষ্ম রশ্মি থেকে বনস্পতি কোষ নির্মাণের সহস্র ধাপ পর্যন্ত সঞ্চালন কোনো মনগড়া প্রক্রিয়ার দ্বারা হওয়া সম্ভব হবে না আর না এইসব নিষ্প্রয়োজন আর অনিয়ন্ত্রিত প্রক্রিয়া হবে, বরং এটা হচ্ছে ঈশ্বর তত্ত্ব দ্বারা বুদ্ধিপূর্বক প্রেরিত, নিয়ন্ত্রিত আর একটা বিশিষ্ট প্রয়োজনযুক্ত প্রক্রিয়া। এক-একটা কোষের সঞ্চালনকে ভালো করে লক্ষ্য করুন, তাহলে দেখবেন যে এরমধ্যে কয়েক আরব সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম কণার একটা বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক সংযোগ আছে আর তারমধ্যে প্রত্যেকটা কণা শত-শত সূক্ষ্ম বৈদিক রশ্মির বিশিষ্ট সংযুক্ত বা বিকশিত রূপ আছে. এর জন্য সর্বত্র চেতন শক্তির অনিবার্য ভূমিকা আছে, যাকে ছাড়া এই প্রক্রিয়া এক পাও এগোবে না. এটাও মনে রাখতে হবে যে জল, বায়ু, ভূমি আর তারমধ্যে বা তারদ্বারা নানা জীবনীয় তত্ত্ব তৈরির পর সর্বপ্রথম বনস্পতিরই উৎপত্তি হয়। বনস্পতি কোষের উৎপন্ন হওয়া, তার জীবিত থাকা আর সেটা বিকশিত হয়ে গাছপালা উৎপন্ন হওয়ার জন্য আবশ্যক তত্ত্বের উৎপত্তি আগে থেকেই হয়ে থাকে, তার পশ্চাৎই বনস্পতি কোষের জন্ম রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা হয়। প্রাণী কোষ বনস্পতি নির্মাণের পশ্চাৎই উৎপন্ন হয়। তার কারণ হল সব জীব-জন্তু বনস্পতির উপরই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ রূপে নির্ভরশীল। মাংসাহারী প্রাণী শাকাহারী প্রাণীর উপর নির্ভরশীল, এইজন্য বনস্পতি উৎপত্তির পশ্চাৎ জীব-জন্তুদের উৎপত্তি এককোষীয় জীব থেকেই শুরু হয়। বনস্পতির মধ্যেও সহজ থেকে জটিল গঠনকারী বনস্পতির ক্রমিক

উৎপত্তি হয়। ক্রমিক উৎপত্তির মানে এই নয় যে শৈবাল বিকশিত হয়ে বটবৃক্ষ হয়ে যায় অথবা পিপল, আম আর কাঁঠাল বাদামের রূপ নেয়। এইভাবে এককোষীয় জীব অ্যামিবার উৎপত্তি ভূমি বা জলে হয়, কিন্তু কোনো জীব সেটা এককোষীয় হোক বা বহুকোষীয়, তাতে কেবল কিছু পদার্থের রাসায়নিক সংযোগ মাত্রই হয় না বরং তার ভিতরে সূক্ষ্ম চেতন তত্ত্ব জীবাত্মারও সংযোগ হয় আর সম্পূর্ণ সংযোগই হচ্ছে জীবের রূপ। বর্তমান বিজ্ঞানও রাসায়নিক সংযোগ দ্বারা কোষের উৎপত্তি স্বীকার করে-

A very important step the formation of a cell must have been the development of lipid membrane. In order that biological systems can function efficiently, it is essential that the enzymes connected with successive stages of synthesis of biochemical pathway should be in a close a proximity to one another. The necessary conditions for this are obtained in cells by means of lipid membranes which can maintain local high concentration of reactants. The presence of hydrocarbons early in the earth's history has already been mentioned....

Life requires for its maintenance a continuous supply of energy this could have been provided by ultraviolet or visible light from the sun, or possibly partly from the breakdown of unstable free radiations produced in the earth's atmosphere by ultraviolet light.

[Cell Biology, page - 474 by E.J. Ambrose & Dorothy M. East, London -1973]

অর্থাৎ এই পৃথিবীতে রাসায়নিক, জৈবিক ক্রিয়ার দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের এনজাইমসের নির্মাণ হয়ে জীবন হেতু আবশ্যক পদার্থের নির্মাণ হয়েছে। একইসঙ্গে নানাবিধ রাসায়নিক পদার্থ দ্বারাই কোষীকা ভিত্তিক তথা জীব দ্রব্যাদির নির্মাণ এই ভূমিতে হয়েছিল আর কোষকে নিরন্তর পোষণ দেওয়ার কাজ পৃথিবীতে উপস্থিত আবশ্যক রাসায়নিক পদার্থগুলো তথা সূর্যের প্রকাশ করেছে। কিছু বৈজ্ঞানিক এমন বিশ্বাস করে যে পৃথিবীতে জীবন অন্য কোনো গ্রহ থেকে এসেছে, তাদের কাছে আমি জানতে চাই যে, যেভাবে অন্য কোনো গ্রহতে জীবনের উৎপত্তি হতে পারে, সেইভাবে এই পৃথিবীতে কেন হতে পারবে না ?

বস্তুতঃ এই ধরনের বিচার সর্বথা অপরিপক্ক চিন্তার পরিনাম। বর্তমান কিছু বৈজ্ঞানিকরাও এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত নয়। তারা বলে যে –

The view the life did in fact originate on the earth itself after it had cooled over a period of many thousands of years is almost universally accepted today. [Cell Biology, page - 474]

যেসব বৈজ্ঞানিকরা অ্যামিবা থেকে বিকশিত হয়ে অর্থাৎ এক প্রজাতি থেকে দ্বিতীয় প্রজাতির উৎপত্তি হওয়ার কথা বলে, তারা এটা ভাবে করে না যে, উদ্ভিদ বা প্রাণীর মধ্যে এই ধরনের পরিবর্তন সম্ভব না আর না এর কোনো প্রয়োজন আছে। আমি এখানে বৈজ্ঞানিকদের কল্পিত আর মিথ্যা বিকাশবাদের উপর কোনো প্রশ্ন এইজন্য করবো না, কারণ আমি এর আগেও অনেক প্রশ্ন তার উপর করেছি। যারা ডারউইনের বিকাশবাদের বিস্তারিত পর্যালোচনা জানতে চায়, তাদের আর্য বিদ্বান

পণ্ডিত রঘুনন্দন শর্মা দ্বারা লিখিত 'বৈদিক সম্পত্তি' নামক গ্রন্থ পড়া উচিত। প্রশ্ন হচ্ছে যখন রাসায়নিক বিক্রিয়া দ্বারা অ্যামিবার উৎপত্তি হতে পারে, তখন বিভিন্ন প্রাণীর শুক্রাণু আর ডিম্বাণুর উৎপত্তি কেন হতে পারবে না ? যখন ৫০০ এরও অধিক গুণসূত্রকারী অ্যামিবা রাসায়নিক অভিক্রিয়া দ্বারা উৎপন্ন হতে পারে, তখন বানর, শিম্পাঞ্জি, অরাঙ্গুটান যাদের গুণসূত্র ৪৮-৪৮, আবার ৪৬ গুণসূত্রকারী মানুষের মধ্যে স্ত্রী আর পুরুষের ২৩-২৩ গুণসূত্রকারী শুক্রাণু আর ডিম্বাণুর উৎপত্তি অ্যামিবার মতো কেন হতে পারবে না? মানুষের সমান গুণসূত্রকারী হরিণের মতো পশু Sable Antelope তথা Reaves's Muntjac নামক হরিণের শুক্রাণু আর ডিম্বাণুর, ৫৬ গুণসূত্রকারী হাতির শুক্রাণু আর ডিম্বাণুর উৎপত্তি কেন হতে পারবে না ? পিঁপড়া, যাদের গুণসূত্র কেবল ২, তারা কেন উৎপন্ন হতে পারবে না ?

এখানে বৈদিক মত এই হল যে, যেসব জীবের ভরণ-পোষণ হেতু যত কম পদার্থের আবশ্যকতা হয়, সেইসব জীবই তত আগে উৎপন্ন হয়। সব জীবের মধ্যে বনস্পতির উৎপত্তি সবার আগে হয় আর মাংসাহারী প্রাণীদের আগে শাকাহারী প্রাণীদের উৎপত্তি হয় তথা শাকাহারীদের মধ্যে মানুষ হচ্ছে এমন এক প্রাণী, যাকে সবথেকে বিকশিত আর উন্নত মানা যেতে পারে আর তারা বিভিন্ন প্রাণী আর উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল, তাই তাদের উৎপত্তি সবার শেষে হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, মাতা হীন ভ্রূণের বিকাশ কিভাবে হয়েছে?

শুক্রাণু আর ডিম্বাণুর তো ধরে নিন রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলস্বরূপ ভূমি বা জলের মধ্যে হয়েছে কিন্তু শুক্রাণু আর ডিম্বাণুর নিষিক্তকরণ আর ভ্রূণের বিকাশ কোথায় আর কিভাবে হয়েছে? এই বিষয়ে মানব উৎপত্তির চর্চায় মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী জী তাঁর 'সত্যার্থ প্রকাশ' নামক গ্রন্থে যুবকাবস্থাতে ভূমির মধ্যে উৎপত্তি বলেছেন। তিনি তর্ক দিয়েছেন যে, যদি শিশু অবস্থায় উৎপন্ন হতো তাহলে তাদের রক্ষা আর পালন কে করতো তথা যদি বৃদ্ধ উৎপন্ন হতো তাহলে বংশপরম্পরা কিভাবে চলতো? তাই মানুষের উৎপত্তি যুবকাবস্থাতেই ভূমির মধ্যে হয়েছে। যদিও তিনি এই বিষয়ে কোনো প্রমাণ দেননি কিন্তু আমি এই বিষয়ে ঋগ্বেদের প্রমাণ পেয়েছি, যেখানে লেখা আছে –

উপ সর্প মাতরম্ ভুমিমেতামুরুব্যচসম্ পৃথিবীম্ সুশেবাম্.
ঊর্ণম্রদা যুবতির্দক্ষিণাবত এষা ত্বা পাতু নির্ঋতেরুপস্থাত্..

(ঋ০ মন্ডল ১০ সূক্ত ১৮ মন্ত্র ১০)

এর উপর আমার আধিভৌতিক ভাষ্যঃ হে জীব! **(সুশেবাম্)** {সুশেবঃ সুসুখতমঃ – নিরু০ ৩/৩} উত্তম সুখ প্রদানে সর্বোত্তম **(এতাম্)** এই **(মাতরম্)** মাতার সমান **(ভূমিম্)** প্রারম্ভে যাহার গর্ভে সকল প্রাণী উৎপন্ন হয়ে বা যাহার উপর সব প্রাণী নিবাস করে, সেই পৃথিবী **(উরু-ব্যচসম্)** অতি বিস্তারবান হয়ে সকল ভ্রূণকে **(উপ সর্প)** নিকটতা থেকে প্রাপ্ত হয়, ইহার সাথেই ওই গর্ভের আন্তরিক আবরণ নিরন্তর হালকা স্পন্দন করতে থাকে **(ঊর্ণম্রদা)** {ঊর্ণম্রদা ইত্যূর্ণমৃদ্বীত্যেবৈতদাহ – কাশ০ ৪/২/১/১০; সাধ্বী দেবেভ্য ইত্যেবৈতদাহ য়দাহোর্ণম্রদসম্ ত্বেতি – শ০ ১/৩/১/১০}

সেই ভূমি ঐ ভ্রূণকে এইরূপ আচ্ছাদন প্রদান করে, যাহা পশমের সমান কোমল, মসৃণ বা আরামদায়ক. তাহা সেই দিব্য ভ্রূণকে সবদিক থেকে গর্ভকে সমান সুখদায়ক স্পর্শযুক্ত ঘর প্রদান করে. **(যুবতীঃ)** সেই গর্ভরূপ পৃথিবীতে নানা জীবনীয় রসের মিশ্রণ-অমিশ্রণের ক্রিয়া নিরন্তর চলতে থাকে **(দক্ষিণাবতঃ)** পৃথিবী সেই ভ্রূণকে ততক্ষণ পর্যন্ত পোষণ প্রদান করতে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত তাহা নিজের পালন ও রক্ষণ করতে পূর্ণ দক্ষ অর্থাৎ সক্ষম না হয়ে যায় **(এষা)** এই ভূমি **(ত্বা)** তুমি জীবকে **(নির্ঋতেঃ-উপস্থাত্)** {নির্ঋতির্নিরমণাত্ ঋচ্ছতেঃ কৃচ্ছ্রাপত্তিরিতরা–নিরু০ ২/৮} পূর্ণরূপে নিরন্তর সানন্দ রমণ করে এইরূপ সুরক্ষিত আর উত্তম স্থানে **(পাতু)** সেই ভ্রূণ বা জীবের পালন করে. ইহার সাথে যেখানে ক্লেশ পৌছাতে পারে, এই রকম অসুরক্ষিত স্থান থেকে ওই ভূমির গর্ভরূপ আবরণ সেই জীব বা ভ্রূণকে রক্ষা করে.

উচ্ছ্বঞ্চস্ব পৃথিবী মা নি বাধথাঃ সূপায়নাস্মৈ ভব সূপবঞ্চনা.
মাতা পুত্রম্ য়থা সিচাম্যেনম্ ভূম ঊর্ণুর্হি..
(ঋ০ মন্ডল ১০ সূক্ত ১৮ মন্ত্র ১১)

আমার আধিভৌতিক ভাষ্যঃ **(পৃথিবী)** সেই গর্ভরূপ পূর্বোক্ত পৃথিবী **(উচ্ছ্বঞ্চস্ব)** উৎকৃষ্টরূপে উর্দ্ধ দিশাতে স্পন্দিত হয়ে কিংবা উথলের মতো হয়. **(মা বাধথাঃ)** সেই ভূমির আবরণ এমন হয় যে তাহার ভিতরে বাস করা ভ্রূণ বা জীবের প্রাপ্ত হয়ে থাকা জীবনীয় রসকে থামায় না অর্থাৎ সেই রস চুয়াতে-চুয়াতে সেই জীবকে প্রাপ্ত হতে থাকে. **(অস্মৈ)** তাহা এই জীবনের জন্য **(সূপায়না-ভব)** সেই ভূমি তাহাকে পোষক ও সংবর্ধক

জীবনীয় তত্ত্বের উপহার প্রদান করে **(সূপবঞ্চনা)** {উপবঞ্চনম্=দুবকনা} সেই ভূমির আবরণ ঐ ভ্রূণের বা জীবদের ভালো ভাবে ঢেকে আশ্রয় প্রদান করে **(মাতা য়থা)** যেভাবে মাতা নিজের সন্তানকে কোল বা গর্ভে ঢেকে সুরক্ষা প্রদান করে, সেইভাবে **(নি-সিচা ভূমেঃ)** {নি+সিচ্=উপরে ফেলে দেওয়া, গর্ভযুক্ত করা – আপ্টে} ভূমির সেই ভাগ ঐ জীবদের নিজের গর্ভে নিয়ে তাহার উপর নানা আবরণের দ্বারা **(এনম্)** ঐ জীবদেরকে **(অভি ঊর্ণুহি)** সবদিক থেকে আচ্ছাদিত করে নেয়.

উচ্ছ্বঞ্চমানা পৃথিবী সু তিষ্ঠতু সহস্রং মিত উপ হি শ্রয়ন্তাম্.
তে গৃহাসো ঘৃতশ্চুতো ভবন্তু বিশ্বাহাস্মৈ শরণাঃ সন্ত্বত্র..
(ঋ০ মন্ডল ১০ সূক্ত ১৮ মন্ত্র ১২)

আমার আধিভৌতিক ভাষ্যঃ **(উচ্ছ্বঞ্চমানা)** পূর্বোক্ত উথল আর মৃদু স্পন্দন করে নরম **(পৃথিবী)** ভূমি **(সু তিষ্ঠতু)** ঐ ভ্রূণের বা জীবের আচ্ছাদিকা হয়ে সুদৃঢ়তা দ্বারা সুরক্ষাপূর্বক স্থিত হয়ে ঐ জীবেরও স্থিরতা প্রদান করে **(সহস্রম্ মিতঃ)** সেই ভূমির পৃথক-পৃথক স্থানে অনেক সংখ্যায় **(উপ হি শ্রয়ন্তাম্)** জীব নিকটস্থ থেকে আশ্রয় পায় কিংবা সেই গর্ভরূপ স্থানের মধ্যে বড় সংখ্যাতে {মিতঃ = মিনোতিগতিকর্মা – নিরু০ ২/১৪} বিভিন্ন সূক্ষ্ম অণুর প্রবাহ হয়ে থাকে **(তে গৃহাসঃ)** ভূমির সেই স্থান ঐ জীবের জন্য ঘরের সমান হয় {গৃহাম্=গৃহাঃ কস্মাদ্ গৃহণাতীতি সতাম্ – নিরু০ ৩/১৩} আর ঘরের সমান সেই ভূকোষ্ঠ ঐ জীবকে এমন ভাবে ধরে বা ধারণ করে থাকে, যেমন মাতা তাহার সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে রাখে **(ধৃতশ্চুতো ভবন্তু)** সেই ভূকোষ্ঠ এমন হয় যে ইহার মধ্যে ঘী-এর

সমান মসৃণ রস সর্বদা চুয়াতে থাকে **(অস্মৈ)** তাহা ঐ জীবের জন্য **(বিশ্বাহা)** {বিশ্বাহা=সর্বাণি দিনানি –ম০ দ০ য়০ ভা০ ৭/১০} সর্বদা অর্থাৎ পূর্ণ যুবকাবস্থা পর্যন্ত **(শরণাঃ সন্তু অত্র)** এই অবস্থাতে সেই জীব ঐ কোষ্ঠের মধ্যে আশ্রয় পায়.

এই মন্ত্রগুলোতে ভূমির ভিতরে কিভাবে যুবকাবস্থা পর্যন্ত মানুষ সহ সব জরায়ুজ প্রাণী বিকশিত হয় তার সুন্দর চিত্রন করা হয়েছে। এই জগতে যাবতীয় জীব শ্রেণী চারটা স্তরে বিভক্ত, যথা প্রথম স্তর উদ্ভিজ্জ, দ্বিতীয় স্বেদজ, তৃতীয় ডিম্বজ আর চতুর্থ জরায়ুজ। প্রকৃতির প্রথম স্তরে জীব বৃক্ষলতাদি রূপে জন্মে থাকে, দ্বিতীয় স্তরে জীব স্বেদজ অর্থাৎ জল বা লালা হতে উৎপন্ন হয়। জল সংযুক্ত কোনো দ্রব্য পচে গেলে ঐ প্রকার জীব উৎপন্ন হয়, অথবা কোনো-কোনো বৃক্ষের পত্রে প্রথমতঃ লালার মতো এক প্রকার পদার্থ দেখা যায়, তারপর ক্রমশঃ ঐ লালা হতে শত-শত কীটের উদ্ভব হয়, সেগুলোই স্বেদজ শ্রেণীভুক্ত। এই স্তর হতে তৃতীয় স্তর ডিম্বজ শ্রেণী উৎপন্ন হয় ডিম্ব অর্থাৎ ডিম্বের মধ্য থেকে উৎপন্ন হয়। পরিশেষে প্রকৃতির চতুর্থ স্তর জরায়ুজ শ্রেণীর জীব উৎপন্ন হয়; এই অবস্থাতে মাতৃগর্ভস্থিত জরায়ুর অভ্যন্তরে প্রাণীর সৃষ্টি হয়, এই জরায়ুজের উদাহরণই হচ্ছে মানুষ.

যেভাবে অ্যামিবা আদি এককোষীয় প্রাণীর কোষের নির্মাণ রাসায়নিক আর জৈবিক ক্রিয়ার দ্বারা হয়, সেইভাবে বহু কোষীয় জরায়ুজ তথা ডিম্বজেরও শুক্র তথা রজের নির্মাণ এই উথলানো কোমল তথা সব

আবশ্যক পদার্থ, মাতার গর্ভে যেসব থাকে সেইসব দ্বারা পরিপূর্ণ পৃথিবীর পৃষ্ঠ স্তরের মধ্যে থাকে। এখন আসুন বিবেচনা করা যাক যে, কেন ভ্রূণের পুষ্টির জন্য মায়ের গর্ভের প্রয়োজন? সেটা কারণে, যাতে ভ্রূণ বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি পেতে পারে, ভ্রূণ যেন নিরাপদ নরম, মসৃণ আবরণ তথা প্রয়োজনীয় উষ্ণতা পায়। যদি এই পরিস্থিতিকে মাতৃগর্ভের বাইরে অন্যত্র কোথাও এমন ব্যবস্থা উৎপন্ন করা হয় তাহলে ভ্রূণের বিকাশ সেখানেই হয়ে যাবে, যেভাবে আজ পারখনালী (Test Tube) দ্বারা শিশুর জন্ম করা হয়েছে।

তবে হ্যাঁ, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা হল, সেই সময় মানুষ বা অন্য কোনো জরায়ুজ প্রাণীরা যুবকাবস্থায় ভূমি থেকে উদ্ভিজের মতো উৎপন্ন হয়েছে। ভগবদ্ দয়ানন্দ জী মহারাজের এই কথন সর্বথা উচিত যে, যদি শিশু উৎপন্ন হয় তাহলে পালন কে করবে আর যদি বৃদ্ধ উৎপন্ন হয় তাহলে তার বংশ কিভাবে চলবে? (দেখুন – সত্যার্থ প্রকাশ, অষ্টম সমুল্লাস)

শতপথ ব্রাহ্মরণেও এর উল্লেখ আছে –

মনুষ্যা ঋষয়শ্চ য়ে, ততো মনুষ্যা অজায়ন্ত

(শতপথ ব্রাহ্মণ ১৪/৩/২/৫)

অনুবাদঃ আদিতে অনেক অর্থাৎ শত-শত সহস্র মানুষ উৎপন্ন হয়েছিল।

উপনিষদকার ঋষি একে আরো বিস্তার দিয়েছে –

তস্মাচ্চ দেবা বহুদা সংপ্রসূতাঃ সাধ্যা মনুষ্যাঃ...

(মুণ্ডক উপ০ ২/১/৭)

অর্থাৎ – সেই পরমাত্মার দ্বারা অনেক বিদ্বান সিদ্ধি প্রাপ্তজন তথা সাধারণ

বিদ্বানজন উৎপন্ন হয়েছে। পরমাত্মা সৃষ্টির আদিতে অসংখ্য মানুষকে যুবকাবস্থায় উৎপন্ন করেছে –

উপো রুরুচে যুবতির্ন য়োষা বিশ্ব জীবম্ প্রসুবন্তি চরায়ৈ।
অভূদগ্নিঃ সমিধে মানুষাণামরুজ্যের্তিবাধমনা সমাস্সি।।

(ঋগ্বেদ ৭/৭৭/১)

পদার্থ – (**তমাস্সি**) অজ্ঞানরূপ তমকে (**বাধমানা**) নাশ করিয়ে (**অগ্নিঃ জ্যোতিঃ**) প্রকাশ-স্বরূপ জ্যোতি (**মানুষাণাম্, সমিধে, অকঃ**) মানুষের সম্বন্ধে প্রকট হয়ে যিনি (**প্রসুবন্তি**) প্রসূতাবস্থাতে (**বিশ্ব, চরায়ৈ, জীবম্**) বিশ্বের চরাচর জীবকে (**অভূত্**) প্রকট করে, সেই জ্যোতি (**উপো**) এই সংসারে (**য়ুবতিঃ**) যুবকাবস্থাকারী (**রুরুচে**) প্রকাশিত হয়, (**ন য়োদা**) স্ত্রীর সমান নয়.

ভাবার্থ – এই মন্ত্রে পরমাত্মার জ্যোতিস্বরূপকে বর্ণনা করা হয়েছে অর্থাৎ জগৎজননী জ্যোতিরূপ পরমাত্মা, যিনি জীবমাত্রের জন্মদাতা, তিনিই সৃষ্টির আদিতে সারা বিশ্বের চরাচর জীবদের যুবকাবস্থাতে প্রকট করেছেন, আর সেই পরমাত্মারূপ শক্তিও যুবকাবস্থাতে প্রকট হয় স্ত্রীর সমান নয়।

পরমাত্মাই আদিতে পৃথিবীর সবথেকে উচুতম স্থান তিব্বতে মানুষের সৃষ্টি করেছেন –

উত্তে স্তভনামি পৃথিবীম্ ত্বত্পরীমম্ লোগম্ নিদধন্মোঅহম্ রিষম্।
এতাম্ স্হূর্ণা পিতরো ধারয়ন্তু তেহত্রা য়মঃ সাদনা তে মিনোতু।।

(ঋগ্বেদ ১০/১৮/১৩)

পদার্থ – (**পৃথিবীম্ তে-উত্ স্তভনামি**) হে জীব! তোমার জন্য আমি ঈশ্বর,

পৃথিবীকে জলমিশ্রিত ভূগোল থেকে উপরে টেনে তুলি **(ইমম্ ত্বত্-লোগম্ পরিনিদধত্ - ম - উ - অহম্ - রিষম্)** সেখানে তোমার এই গর্ভকোষকে রেখে আমি পীড়া দিই না **(এতাম্ স্হূণাম্ পিতরঃ-ধারয়ন্তু)** এই উত্থিত পৃথিবীকে সূর্য-কিরণ ধারণ করে **(তত্র য়মঃ-তে সদনা মিনোতু)** সূর্য তোমার জন্য সব প্রয়োজনীয় কোষকে প্রাপ্ত করাবে.

ভাবার্থ – আদিতে সৃষ্টি পৃথিবীর উচুতম স্থানে হয়. সেইস্থান জলমিশ্রিত পৃথিবী থেকে পর্বতভূমি রূপে (তিব্বতের) উর্ধ দিকে টানে। সেই উঠে আসা ভূ-ভাগকে সূর্যের রশ্মি ধারণ করে আর সূর্য তার রশ্মির দ্বারা জীবাত্মার গর্ভদিগকে প্রাপ্ত করায়, অতএব তার দ্বিতীয় নাম হল সবিতা।

আর্য বিদ্বান আচার্য বৈদ্যনাথ জী শাস্ত্রি 'বৈদিক যুগ আর আদিমানব' পুস্তকের মধ্যে আমেরিকার বোস্টন নগর স্মিথ সিনিয়র ইনস্টিটিউটে জীববিজ্ঞানের বিভাগাধ্যক্ষ ডাক্তার ক্লার্ককে উদ্ধৃত করেন –

'Man appeared able to think walk and defend himself.'

অর্থাৎ – সৃষ্টির আদি কালে মানুষ চিন্তন করতে, হাঁটতে আর আত্মরক্ষা করতে সক্ষম উৎপন্ন হয়েছিল।

এখানে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, পৃথিবীরূপ গর্ভের মধ্যে ২৫ বছর পর্যন্ত যুবক কিভাবে পালন আর বৃদ্ধি পায়? তো এর উপর গুরুত্ব সহকারে চিন্তন করলে এরমধ্যে কোনো আপত্তি দেখা যায় না, কারণ যে ভাবে আজ একটা সন্তান যে প্রায় ৯ মাস তার মাতার গর্ভে থাকে। প্রসবের পূর্বে সে না তো শ্বাস নেয়, না কাঁদে, না হাসে, না হাত পা

চালায়, না খায়, না পান করে, মলমূত্র আদিও বিসর্জন করে না, প্রসবের পরই তার এইসব ক্রিয়া দ্রুত শুরু হয়ে যায়। এটা আশ্চর্য ব্যাপার নয় কি, আশ্চার্যজনক কিনা ? যদি কোনো এক ব্যক্তিকে এইসব থেকে দূরে রাখা হয় আর এই প্রসবক্রিয়া সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞানী থাকে তাহলে সে এই প্রসব ক্রিয়াকে সম্ভব মানবেই না। যদি সে কেবল ডিম্বজেরই উৎপত্তি দেখে থাকে তাহলে সে জরায়ুজের প্রসব প্রক্রিয়াকে ডিম্বজের থেকে আলাদা মানতেই চাইবে না। এইজন্য যুবকাবস্থাতে প্রাণীর উৎপত্তি হওয়া অসম্ভব নয়, তবে হ্যাঁ, অদ্ভুত অবশই। আর তাছাড়া সৃষ্টি প্রক্রিয়ার এত জটিলতা, ক্রমবদ্ধতা, বৈজ্ঞানিকতা অদ্ভুত নয় কি? তাহলে যুবকাবস্থাতে প্রাণীদের উৎপত্তি বিচিত্র থাকে কোথায় ?

এটাও জেনে রাখা অতি আবশ্যক যে, যেভাবে রাসায়নিক ক্রিয়ার দ্বারা ভূমিরূপী মাতার ভিতরে প্রাণীদের উৎপত্তি হয়ে সব জরায়ুজ, ডিম্বজ তথা স্বেদজ একই ভাবে ভূমির পৃষ্ঠ স্তর থেকে উদ্ভিজের মতো যুবকাবস্থাতে জন্ম নেয়, সেইভাবে রাসায়নিক অভিক্রিয়ার দ্বারা বিভিন্ন বনস্পতির বীজ ভূমির স্তরে তৈরী হয়ে তথা আবশ্যক পোষক পদার্থ পৃথিবীতেই প্রাপ্ত হওয়ায় সর্বত্র গাছপালা, জঙ্গল বনস্পতি বা বিশালকায় বৃক্ষ পূর্বেই উৎপন্ন হয়েছিল. যেভাবে কোনো প্রাণী উৎপন্ন হয়, তো তার ভোজন সে ততকাল ভূমিতে তৈরী পেয়ে যায়. মানুষের অনেক নর-নারীর জোড়া যুবকাবস্থায় ভূমিতে উৎপন্ন হয়েছিল, সেই সময় তারা তাদের এই পৃথিবী ফল, ফুল, অন্ন আদিতে পরিপূর্ণ পায় আর তারা ভূমি

থেকে বেরিয়ে এসে ফলাদি ওভাবেই খেতে শুরু করে যেভাবে আজকের কোনো শিশু (মানব বা গৌ আদি পশুর) জন্ম হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই মাতার দুগ্ধ পান করা শুরু করে দেয়। এতে কোনো সন্দেহ বা সংশয়ের অবকাশ নেই।

এটা আমি মানুষের উৎপত্তি সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখেছি। আমার খুব অবাক লাগে যে চার্লস ডারউইনের পশ্চাৎ তার পুত্র আর তারসঙ্গে অনেক ইউরোপিয়ান বৈজ্ঞানিকরাও এই মিথ্যা বিকাশবাদের খণ্ডন করেছে কিন্তু পাশ্চাত্যের দাস হয়ে থাকা কথিত প্রবুদ্ধের মস্তিষ্কে এখনও চার্লস ডারউইনের ভূত বসে আছে।

এখন আমি সংক্ষেপে পণ্ডিত রঘুনন্দন শর্মার দ্বারা লিখিত পুস্তক 'বৈদিক সম্পত্তি' থেকে কিছু বৈজ্ঞানিকের বিচার উদ্ধৃত করতে চাইবো – স্যার অলিভার লজ লিখেছেন –

We are in the process of evolution; we have arrived in this planet by evolution. That is all right. What is evolution? Unfolding development-unfolding as a bud unfolds into a flower, as an acron into an oak. Everything is subject to a process of growth, of development, of unfolding. (Science and Religion, p.16.)

অর্থাৎ – আমরা বিকাশেরই প্রবন্ধাধিন। আমরা এই পৃথিবী গ্রহে পৌঁছেছি শুধুমাত্র বিকাশের মাধ্যমেই। এইসব সত্য কিন্তু বিকাশ কী? বিকাশ হচ্ছে অবাধিত অগ্রগতি। অবাধিত অর্থাৎ কুঁড়ি থেকে ফুল হওয়ার নিয়ম, বীজ থেকে গাছ হয়ে যাওয়ার উপায়। প্রত্যেকটা পদার্থ কুঁড়ি থেকে ফুলের

মতো অবাধিত উন্নতিরই ফল। (বৈদিক সম্পত্তি পৃষ্ঠা ১৫০)

There is manifest progress in the succession of being on the surface of the earth. This progress consists in an increasing similarity of the living fauna, and among the vertebrates especially, in their increasing resemblance to man. But this connection is not the consequence of a direct linkage between the fauna of different ages. There is nothing like parental descent connecting them. The fishes of the Paleozoic age are in no respect the ancestors of the reptiles of the secondary age, nor does man descend from the mammals which preceded him in the Tertiary age. The link by which they are connected is of a higher and immaterial nature and Himself, whose aim in forming the earth, in allowing it to undergo successively all the different types of animals which have passed away, was to introduce man upon the surface of our globe. Man is the end towards which all the animal-creation has tended from the first appearance of the Paleozoic fishes. (Principles of Zoology, Pg. 205-206 by Agassiz)

অর্থাৎ – পৃথিবীতে জন্মেছে এমন অস্থিহীন প্রাণী আর মানুষের মতো অস্থিযুক্ত প্রাণীর মধ্যে একইরকম অগ্রগতি দেখা যায়, কিন্তু এই সমতার মানে এই নয় যে এক ধরনের প্রাণী আরেক ধরনের প্রাণীতে বিকশিত হয়ে যায়। আদিমকালীন মৎস্য সর্পনশীল প্রাণীদের পূর্বজই নয় আর না মানুষ

অন্য স্তন্যপায়ী প্রাণী থেকে বিকশিত হয়েছে, প্রাণীদের শৃঙ্খলা কোনো অভৌতিক তত্ত্বের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে, যা পৃথিবীতে বহু প্রকারের জীব সৃষ্টি করার পর শেষে মানুষের সৃষ্টি করেছে. (বৈদিক সম্পত্তি পৃষ্ঠা ১৫০, ১৫১)

How did living creatures begin to be upon the earth? In point of science, we do not know. – Introduction to Science, Pg. 142 by J.A. Thomson

অর্থাৎ – বিজ্ঞানের মাধ্যমে আমরা জানি না যে কিভাবে পৃথিবীতে জীবের সৃষ্টি হয়েছে. (বৈদিক সম্পত্তি পৃষ্ঠা ১৫২)

The question is: what was the manner of their being upon the previously tenantless Earth? Our answer must be that we do not know. – Evolution, Pg. 70 by Prof. Patrick Geddes

অর্থাৎ – এই নির্জন পৃথিবীতে কিভাবে প্রাণীর উদ্ভব হল ? এই প্রশ্নের উত্তর আমরা জানি না. (বৈদিক সম্পত্তি পৃষ্ঠা ১৫২)

১৯২২ সালের নভেম্বরের ছমু হম নামক পুস্তকে Jones Bowson লিখেছেন যে, *‘ব্রিটিশ মিউজিয়ামের অধ্যক্ষ ডঃ এথ্রিজ বলেছেন – এই ব্রিটিশ মিউজিয়ামের মধ্যে এমন একটাও বস্তু নেই, যেটা প্রমাণ করতে পারে যে প্রজাতিদের (Species) মধ্যে পরিবর্তন হয়েছে. বিকাশের বিষয়ে দশটার মধ্যে নয়টাই নিরর্থক আর অসার. সেগুলো গবেষণার আধার সত্যতা আর নিরীক্ষণের উপরে একেবারেই অবলম্বিত নয়. সারা সংসারে এমন কোনো বস্তুই নেই যেটা বিকাশের সহায়তা করে.’*

(বৈদিক সম্পত্তি পৃষ্ঠা ১৭০)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ক্রিশ্চিয়ান হেরাল্ডে এই খবর প্রকাশিত হয় যে, অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে ব্রিটিশ সায়েন্স সোসাইটির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রফেসর উইলিয়াম ওয়াটসন তার সভাপতি ছিলেন। তিনি তার বক্তৃতায় বলেছেন যে– *'ডারউইনের বিকাশবাদ একেবারেই অসত্য আর বিজ্ঞান বিরুদ্ধ।'*

প্রো০ প্রেট্রিক গেডিস বলেছেন –

For it must be admitted that the factors of the evolution of man partake largely of the nature of the may-be's which has no permanent position in Science. – Ideals of Science and Faith.

অর্থাৎ – মানুষ আগের মতোই আছে তার প্রমাণ এই যুদ্ধ।

(বৈদিক সম্পত্তি পৃষ্ঠা ২১২)

স্যার জে০ ডব্লিউ ড্যাসন বলেছেন – *'একটা বাঁদর আর একটা মানুষের মধ্যে আকৃতি সম্পর্কে বিজ্ঞান কিছুই জানে না। মানুষের প্রাচীনতম হাড়গুলোও বর্তমান মানুষেরই মতো। এরমধ্যে সেই বিকাশের কোনো আধারই মেলে না, যা এই মানব দেহের আগে ছিল।'*

(বৈদিক সম্পত্তি পৃষ্ঠা ১৭০)

সিডনি কোলেট বলেছেন – 'বিজ্ঞান স্পষ্ট সাক্ষী যে মানুষ অধঃপতিত অবস্থা থেকে উন্নত অবস্থায় না গিয়ে উল্টো অধঃপতনের দিকে যাচ্ছে। মানুষের আরম্ভিক অবস্থা উন্নত ছিল।'

(বৈদিক সম্পত্তি পৃষ্ঠা ১৭১)

আচার্যবৈদ্যনাথ জী শাস্ত্রি দ্বারা লিখিত ‘বৈদিক যুগ আর আদিমানব’ পুস্তকের পৃষ্ঠা ১১ থেকে উদ্ধৃত –

Now a day unhappily Jelly fish produces nothing but Jelly fish. But had that gelatinous morsel been fated to live. Say a million of centuries earlier it might have been the progenitor of the race from which Homer and Plato, David and Paul, Shakespear and our eminent professor have in their order been evolved.

(Conder’s Natural Selection and Natural Theology)

If it could be shown that the thrush was hatched from the lizard.

(Conder’s same book)

Bergson নোবেল পুরস্কার পান Anti Darwin theory দেওয়ার জন্য, তা সত্ত্বেও আমাদের প্রবুদ্ধরা কিছুই বুঝলেন না. ইন্টারনেটে অনেক বিদেশী বৈজ্ঞানিকদের Neo Darwinism আদিতে ডারউইন বিরোধী চর্চা পাঠকগণ দেখতে পাবেন। এদিকে ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের চর্চার প্রসঙ্গে আর্য বিদ্বান স্বামী বিদ্যানন্দ সরস্বতী দ্বারা রচিত ‘সত্যার্থ ভাস্কর’ গ্রন্থের পৃষ্ঠা ৮৭৭ উদ্ধৃত করা এখানে প্রাসঙ্গিক –

বনস্পতিশাস্ত্রের অন্তঃরাষ্ট্রীয় খ্যাতিপ্রাপ্ত বিদ্বান ডঃ বীরবল সাহনিকে জিজ্ঞেস করা হয় – ‘আপনি বলেছেন যে, প্রারম্ভে একটা কোষের প্রাণী জীবিত ছিল সেখান থেকে উন্নত হয়ে তারা বড়-বড় প্রাণীতে পরিণত হয়েছে. আপনি আরও বলেছেন যে, প্রারম্ভে অনেক কম জ্ঞান ছিল তারপর ধীরে-ধীরে উন্নতি করে জ্ঞান এই অবস্থায় এসে পৌছায়, যেখানে

বিজ্ঞান আজ পৌঁছেছে. তাহলে আপনি বলুন তো – Wherefrom did life come in the very beginning and wherefrom did knowledge come in the very beginning ? অর্থাৎ – প্রারম্ভে জীব কোথা থেকে এসেছে আর প্রারম্ভে জ্ঞান কোথা থেকে এসেছে ? কারণ শূন্য থেকে জীবন হয়ে গেছে এটা মানা সম্ভব নয়.

ডঃ সাহনি এর উত্তরে বলেন যে, এরসঙ্গে আমাদের কোনো সম্বন্ধ নেই যে জীব আর জ্ঞান কোথা থেকে এসেছে. আমরা এই বার্তা স্বীকার করে চলি যে প্রারম্ভে কিছু জীব আর কিছু জ্ঞানও ছিল –

'With this we are not concerned as to where from life came in the very beginning or wherefrom knowledge came in the very beginning. We are to take it for granted that there was some life in the beginning of the world and there was knowledge also in the beginning of the world and by slow progress it increased.'

এখানেও বিকাশবাদের দুর্বলতা দেখা যায়। পরিশেষে আমি শুধু ভারত নয় সারা বিশ্বের প্রবুদ্ধ মানব আর বিজ্ঞানীদের অনুরোধ করতে চাইবো যে, নিজের ইতিহাস নিয়ে গর্ব করতে শিখুন. আপনারা সবাই এটা তো মানেন আর জানেন যে, বেদ হচ্ছে পৃথিবীর সবথেকে প্রাচীনতম গ্রন্থ. বেদ যে ঈশ্বরীয় জ্ঞান সেটা প্রমাণ করার ক্ষমতাও আমার আছে তথা বেদ মন্ত্ররূপী ধ্বনি তরঙ্গ থেকেই মহাবিশ্বের উৎপত্তি হয়েছে অর্থাৎ যে ধ্বনি তরঙ্গ থেকে মহাবিশ্বের উৎপত্তি হয়েছে, সেই ধ্বনিগুলোই হচ্ছে বেদ মন্ত্র আর বর্তমানে সেই একই তরঙ্গ সর্বত্র বিদ্যমান আছে. এটাই

হচ্ছে আমার **Vaidic Rashmi Theory of Universe**, যেটা এই মহাবিশ্বকে বর্তমান ভৌতিক-বিজ্ঞানের চেয়ে অনেক আগে পর্যন্ত বোঝাতে পারে. আমি এই প্রবন্ধে ঋগ্বেদের মন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের উৎপত্তি নিয়েও আলোচনা করেছি. বেদ আর ঋষিদের মত হল – মানুষের প্রথম প্রজন্ম ছিল সবচেয়ে বুদ্ধিমান, শারীরিক আর মানসিক শক্তি সত্ত্ব গুণের অধিকারী. এর পশ্চাৎ তাদের মধ্যে বরং শুধু ঘাটতিই হয়েছে, বিকাশ নয়নি. আমরা সারা বিশ্বের সব মানব হচ্ছি সেই মহান পূর্বপুরুষদেরই বংশধর. বেদ হচ্ছে আমাদের সবার, ঋষিরা হচ্ছে আমাদের সবার পূর্বপুরুষ. বেদ আর ঋষিদের গ্রন্থের উপর শুধু মানুষ নয়, মহাবিশ্বের সব বুদ্ধিমান প্রাণীর অভিন্ন অধিকার আছে. আসুন, আমরা সবাই মিলে এই অভিন্ন ঐতিহ্যকে গ্রহণ করি, অধ্যয়ন আর অনুসন্ধান করি আর গর্ব করে নিজেকে পৃথিবীর সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তিদের বংশধর বলি. আমি শুধু জৈব-বিকাশ নিয়ে আলোচনা করেছি, জ্ঞান আর ভাষার কথিত ক্রমান্বয়ের বিকাশ নিয়ে একটা পৃথক নিবন্ধ বা বইয়ে সমালোচনা করা যেতে পারে. জৈব-বিকাশ নিয়ে এখানে এক সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি মাত্র, তা না হলে এই নিবন্ধটা একটা পুস্তিকা আকার ধারণ করত. বিজ্ঞ পাঠক, জ্ঞান আর ভাষার বিকাশের সঙ্গে সমগ্র মহাবিশ্বের বিস্ময়কর বিজ্ঞানকে জানতে আর বুঝতে 'বেদ বিজ্ঞান-আলোক' নামক আমার পুস্তক অধ্যয়ন করুন. তবে হ্যাঁ, আমি আরও একটা কথা বলা উপযুক্ত বলে মনে করি যে, যদি কোনো প্রবুদ্ধ এমন জিজ্ঞেস করে যে – 'যখন

সূক্ষ্ম রশ্মি বিকাশ যাত্রা করতে-করতে নানা কণা, ফোটন আর বিশ্বকে উৎপন্ন করতে পারে অথবা তাদের রূপে প্রকট হতে পারে, তাহলে অ্যামিবা থেকে মানবদেহের বিকাশকে কেন মিথ্যা বলছেন?’ এই বিষয়ে আমি নিবেদন করবো যে, জড় জগতের নির্মাণ বা বিকাশে, রশ্মি কণা বা ফোটন প্রায়শই তাদের স্বরূপকেও বজায় রাখে, কিন্তু কোনো বিকাশবাদী এটা মানবে না যে বিভিন্ন প্রাণীর দেহে অ্যামিবা তার স্বরূপে উপস্থিত আছে, তাই এই তুলনা ন্যায্য নয়.

আমার মিত্রগণ! একটু বিবেচনা করুন, যে ব্যক্তি বা সমাজ নিজেকে পশুর বংশধর বলে, তাদের আত্মমর্যাদা কোথায় থাকবে? এই বিষয়ে লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ে দেওয়া এক বক্তৃতায় নাসার বিজ্ঞানী আর ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা প্রফেসর ডঃ ওমপ্রকাশ পাণ্ডে জী ডারউইনের বিকাশবাদকে প্রত্যাখ্যান করে ঠিকই বলেছেন যে, ‘সারা দেশে শিশুদের ভুল সিদ্ধান্ত শেখানো হচ্ছে, যা তাদের খারাপভাবে প্রভাবিত করছে।’ (নবভারত টাইমস-২ ফেব্রুয়ারি ২০১৮) আসুন, আমি আপনাদের এই হীনমন্যতার গর্ত থেকে বের করে সর্বোচ্চ শিখরে নিয়ে যেতে চাই। আসুন, আমরা সবাই একই ঈশ্বরের পুত্র-কন্যা আর এই পৃথিবী আমাদের আদি জন্মদাত্রী, তাই পুরো পৃথিবীটাই হচ্ছে একটা পরিবার। এই পরিবারকে সুখ, শক্তি আর আনন্দের দিকে নিয়ে যাওয়া আমাদের সব মানুষের দায়িত্ব। আমাদের খোলা মন নিয়ে বিজ্ঞান অধ্যয়ন করার চেষ্টা করা উচিত। আমাদের পূর্বাগ্রহ (কুসংস্কার) পরিহার করে

সত্য-অসত্যকে চেনার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

– আচার্য অগ্নিব্রত নৈষ্ঠিক
(বিশ্ব বৈদিক বিজ্ঞানী)
Vaidic and Modern Physics Research Centre
(Shri Vaidic Swasti Pantha Nyas)
Ved Vigyan Mandir, Bhagal Bhim, Bhinmal
Dist. Jalore, Rajasthan 343029
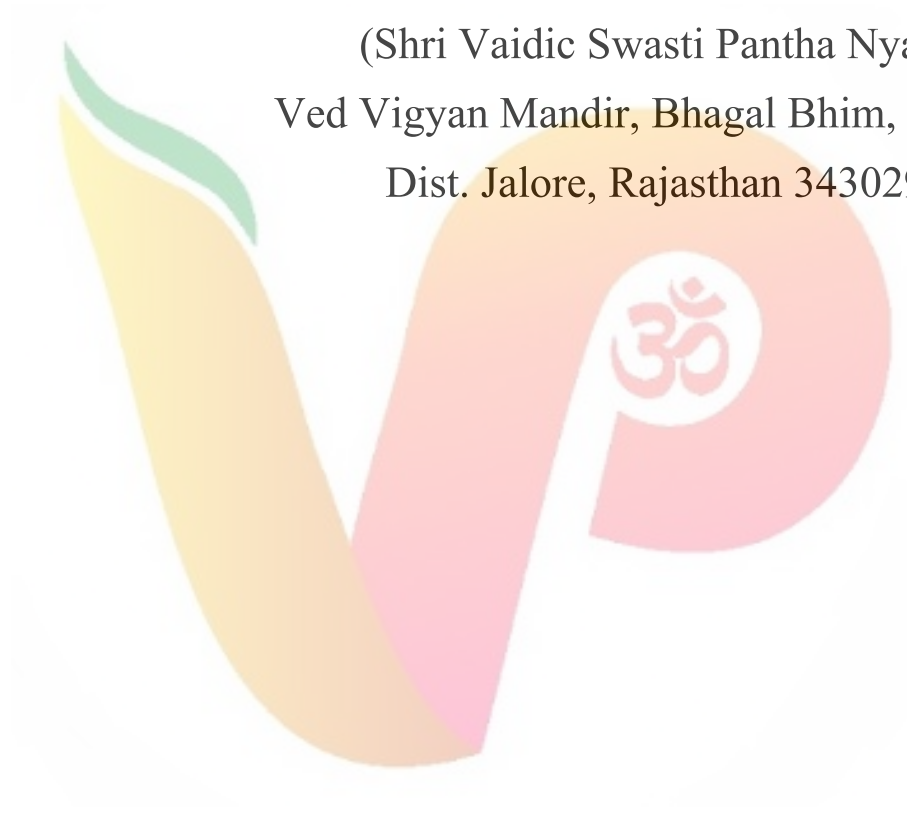
Recent Development on Cosmology, BHU 2018